

হামিরউদ্দিন মিদ্যা

প্রেমপাগল কিংবা পাগলের প্রেম বৃত্তান্ত

সন্ধে নামছে। উঠোনের পাশে শিমুল গাছের ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে, সামনের পুকুরটার পশ্চিম পাড়ের বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে ঝুপ করে বেরিয়ে পানির উপর হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চাপ-চাপ আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দুটো ঘুঘু পাখি সাঁইসাঁই ডানা মেলে উড়ে এসে শিমুল গাছটাকে টেকা দিতে পারেনি যে গ্যাঁড়া-গুরগুটে কুল গাছটা পুকুরের পানির দিকে হেলে পড়েছে, তার ঝাঁকড়-ঝুমুর ডালপালার আড়ালে বসে আচমকা ডাক পাড়ে, ঘুঘুর-ঘু, ঘুঘুর-ঘু। দক্ষিণ পাড়ে সদ্য গজিয়ে ওঠা ঢালি রাস্তার ধারে চা-চপের দোকানে ভিড়টা কমতে থাকে। একটুক্ষণ আগেই মাগরিবের আজান দিয়েছে মোয়াজ্জিন।

খদ্দেরের পথ চেয়ে সামেদ মণ্ডলকে এতক্ষণ বসে থাকতে হয় না। সন্দের আগেই মুরগির গোশ ফুরিয়ে যায়। আজ বেশি জবাই করা হয়ে গেছে। যদিও একসঙ্গে বেশি গোশ করে রাখে না সামেদ। আজ শেষ মুহূর্তে পাশের গ্রামের এক খদ্দের এসে পড়ে। তার বাড়িতে নাকি কুটুম্ব এসেছে, এক কিলো গোশ না দিলেই নয়। বাধ্য হয়ে দু-কিলো ওজনের মুরগিটা কাটতে হয় সামেদকে, ওটাই গাদালের সব থেকে ছোটো। ভেবেছিল আর কেউ নিলে ভালো, নয় তো বাকিটা ঘরেই খেয়ে নেবে।

বাকি গোশটুকু নিয়েই সামেদ বসে আছে শিমুলতলায়। রমজান মাস হলেও রোজা রাখেনি। এই কয়েকদিন শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তার ওপর প্রচণ্ড রোদ-গরম। উপোস দিতে পারেনি। রাস্তার ধারেই দু-কুঠুরি উপর-নীচে খড়ের ছাউনি বাড়ি তার। রোজ বয়লার মুরগির গোশ বেচে। শুধু জুম্মাবার ছাড়া। শুক্রবারে ইয়াসিন কসাই গোরু পাড়ে। সেইদিন মুরগির গোশ নেয় না কেউ।

টগর পিঁড়েতে দাঁড়িয়েই হাঁক পাড়ল, আক্কা তুমি নামাজ পড়তি যাবেনি?

সামেদ মেয়ের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিল, না মা, আজ ঘরেই পড়ি লিব।

আসলে পরশু মেয়ে জামাই এসেছিল, জামাই কাল ঘর গেল। গোটা মুরগি জবাই করেছিল সামেদ। তাই আজ আর গোশ খাওয়ার ইচ্ছা নেই। দাঁড়িপাল্লাটা ধুয়ে এবার উঠবে, এমন সময় চাপ দাড়িওয়ালা একজন এসে দাঁড়াল সামনে। চিনতে পেরে সামেদ বলল, আরে ইলিয়াস ভাই যে। এতদিন পর এমুখো। বসো বসো।

পাহার দিকে বুলে পড়া পাঞ্জাবিটা গুটিয়ে নিয়ে ইলিয়াস বেঞ্চিটায় বসল।

না এসে উপায় ছেলনি সামেদ ভাই। এইমাত্র মেয়ে জামাই এল। সাঁঝের বেলা কী যে জোগাড় করব। ঘরে মুরগিও নাই তেমন, একটা খাড়ি আছে সেটা আবার ডিমে তা' দিচ্ছে।

তুমার ভাগ্যটা খুব ভালো ভাই, মাগরিবের আগেই সব চুকে যায়।

সে তো বুজতেই পাচ্ছি, না পেলো গুটা লিয়ে যেতাম। — গোশটা নিয়ে ইলিয়াস এবার চলে যাবে, এমন সময় সামেদ বলল, বসো বসো, একটু চা খেয়ি যাও।

আরে না না, সাইফুলের মাকে আর কষ্ট করতি হয় না।

সামেদ হাসি মুখে বলল, সাইফুলের মাকে কেনে কষ্ট করতি হবেক গো, টগর এইচে যে পরবে। সামেদ ঘরের দিকে মুখ করে হাঁক পাড়ে, কই গো মা। দু-কাপ চা কর তো।

প্যাকেট থেকে বিড়ি বের করে সামেদ ইলিয়াসের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। নিজেও ধরাল একখানা।

তা ব্যাবসা কেমন চলছে সামেদ? বিড়িতে সুখটান দিয়ে জিজ্ঞেস করে ইলিয়াস।

আল্লার রহমতে চলছে কুনুরকম। তবে সব খদ্দের তো একলা পাই না। তেমাথায় পিরে বাগদি বসছে, হিন্দুরা গোশ লেয় উয়ার কাছে। জবাই করা গোশের লিগে আমার কাছে আসে। সামেদ আকাশের দিকে মুখ তুলে বলে, বীজতলা করলে নাকি?

কী করে করব! ম্যাগের মতিগতি বুঝা দায়! জৈষ্টি মাসের শ্যাষ হতি গেল এখনো বর্ষা ঢুকলনি। রেডিওতে বলছে, উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকি পড়িছে।

অন্যবছর দু-একদিনের মধ্যিই তো ঢুকি পড়ে, সবই আল্লার দান। তেনার রহম না জাগলে মানুষের কিছুই করার নাই! এবছর মাঠের পুকুরগুলোও ছাতিফাটা।

ওদিকে ঘরের মেঝের ভেতর জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে টগর। জামিলা বিবি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, চা টা করি দিয়েই চলি এলি যে মা? যা একবার দিইয়ে আয়। ইলিয়াস সম্পর্কে ভাসুর হয় জামিলার। মাথার চুল পাকতে গেল, এখনো লাজ যায়নি।

টগর চিন্তায় পড়ে যায়। সেই ফাঁকেই বেরোতে হবে? যদি খ্যাপাটা কাছে চলে আসে! অনেকক্ষণ ধরেই জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। সেই ভয়েই চা নিয়ে বেরোয়নি টগর। ঘরের পেছনে খামারটা বছরে দু-বার নতুন প্রাণ ফিরে পায়। এখন ঘাস, লতাপাতা, আলাপালা গাছের জঙ্গল। দুটো খড়পালুই আছে। বেশ আড়াল-আবডাল। টগর যেদিন থেকে এসেছে খ্যাপাটা ঘুরঘুর করছে। কেউ না থাকলে টগর চেয়ে দেখে জানালা দিয়ে। কিন্তু লোকজনের সামনে এড়িয়ে চলে। খ্যাপার মন, কখন কী করে বসবে তার কাণ্ডজ্ঞান নেই। টগর ভাবল, চা-টা চট করে দিয়েই চলে আসব।

চা নিয়ে বাইরে বেরোতেই চমকে উঠল। খ্যাপা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে এদিকে মুখ করে। ইলিয়াস হাসি মুখে বলল, জামাইকে পরবে আটকে রাখতে লারলি মা?

টগর মুখ চুন করে বলল, সে থাকার ছেলে লয় চাচা। এলেই ঘর যাবার জন্যি ছটফট করে। বিস্তর কাজ তো! প্রসঙ্গ পালটে বলে, চাচা পাখি পরবে এইচে নাকি?

হ মা, এইমাত্র এল। তাই তো গোশ নিতি এলাম।

টগর খ্যাপার চোখের আড়াল হতে চায়। কিন্তু ইলিয়াস চাচার কথার দড়ি ছিঁড়ে চলে যেতে পারে না। কী যে করে টগর! যা ভয়, তাই হয়! লটর-পটর করে খ্যাপা চলে এল সামনে। কথোপকথন থেমে গেল ওদের। সামেদ চোখ তুলে তাকাল খ্যাপার দিকে।

খ্যাপা চৌকির উপর নামিয়ে রাখা চায়ের গ্লাসটার দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

যা যা, এখান থেকে সর। বলে ইলিয়াস খ্যাপাকে তাড়াবার চেষ্টা করে। সামেদ তার নিজের চায়ের গ্লাসটা বাড়িয়ে দেয় খ্যাপার দিকে, লে বাপ, চা খা।

খপ করে সামেদের হাত থেকে গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে পানি খাওয়ার মতো ঢকঢক করে এক নিমেষেই খেয়ে ফেলল খ্যাপা। তারপর পেছনপানে ঘুরে তাকাতে তাকাতে কোনদিকে উধাও হয়ে গেল।

খ্যাপাটা চলে যেতেই কাঠপুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকা টগরের বুকের ভেতর যে ঝড় উঠল, তার ছিটেফোঁটা আভা বেধে বসে থাকা দুটি মানুষের গায়ে লাগল কি!

ইলিয়াস বলল, আলিজানের মাথাটা একেবারি গ্যাছে। হায় আল্লা। ছেলেটা কী ছিল, আর কী হল বলদিনি।

সামেদ খোঁচা খেল ইলিয়াসের কথায়। যেন আলিজানের খেপে যাবার পেছনে এই মানুষটিই দায়ী। আর দায়ী হবে নাই বা কেন। এত বড়ো অঘটনটা ঘটে যাবার পেছনে সামেদের কি কোনো ভূমিকা নেই? নিজেই দক্ষ হতে থাকে সামেদ। চোখের কোণে পানি চিকচিক করে ওঠে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, খোদা সবই তোমার লেখন। আমি তো চেষ্টা কম করিনি। মোড়ল যা দাবি করল, তা তো আমার সাধ্য ছিলনি।

কিছুদিন মোড়লের চোখের দিকে তাকাতে পারত না সামেদ। একদিন মাঠ যাবার পথে সামনা-সামনি পড়ে যায়। মোড়ল সামেদের হাতটা খপ করে ধরে ফেলে বলে, কিছু মনে কোরো না সামেদ। আমি ভুল করেছি। আমার লোভের শাস্তি আল্লা আমাকে দেখাল। তাই আমার বুকের ধনটিকে এভাবে কেড়ে নিল। বেঁচে থেকেও না থাকা। মোড়লের চোখগুলো ছল-ছল করে উঠেছিল।

সামেদ আশ্বাস দিয়েছিল, এরকম করে বোলো না মোড়ল মশাই। সবই আল্লার ইচ্ছা! দেখবে ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবেক।

দুই

জামিলা বিবি একদিন সামেদ মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী গো সাইফুলের বাপ, কী এত ভাবছ? তুমার কানে কিছু যায়নি?

কানে আবার আসেনি। সবই তো নিজের চোখে দেখছি। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে জানো। ওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, রঙে লাচছে। মোড়ল কি রাজি হবেক?

ঘরে বসে বসে চিন্তা না করে, একদিন যাও না ওদের বাড়ি। জিজ্ঞেস করে এসো মোড়লের কী মত।

সামেদ মণ্ডল মোড়লের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেল। মোড়ল তো শুনে ঝিঙে ফুলে বাঘ। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে হাঁক পাড়ে, আলিজান ও আলিজান।

বাপের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াল ছেলে। ভয়ে থরথর কাঁপছে।

মোড়ল জিজ্ঞেস করে, কী রে, টগরের সঙ্গে তুর নাকি সম্পর্ক আছে? ঠিক শুনছি তো?

আলিজানের ভয়ে টলমল অবস্থা। কোনোরকম টাল-মাটাল সামলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তা দেখে মোড়লের বুঝতে আর দেরি হয় না।

ঠিক আছে তুই ঘরে যা। বলে সিগারেট ধরাল মোড়ল। আয়েশ করে টান মেরে পাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

দেখো সামেদ, ছেলের যখন মত আছে, আমার কিছুই করার নাই। একটা কথা শুনে রাখো, কুনু ছেলের বিনা পণে বিয়ে আমি দিইনি। ছেলেরা গাড়ি, ভরি-ভরি গয়না, টাকাপয়সা, মানসম্মান সবই পেয়েছে। বউমা গুলোও এক-একটা পরির মতন। আলিজান তো আমার ছোটো ছেলে, জানের জান। এবার তুমিই ভেবে দেখো, পারবে তো এইসব দিতে? সামর্থ্য আছে তুমার আমার ছেলেকে জামাই করার?

সামেদ প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে। মুখটা পাংশুটে হয়ে যায়। তা দেখে মোড়ল খঁচ-খঁচ করে হেসে বলে, বিনা পয়সায় কি চাঁদ ধরা যায় সামেদ। ছেলেকে কি এমনি এমনি মানুষ করেছি?

আমার সামর্থ্য তো সবই জানো মোড়ল। আমার এত মুরোদ নাই মেয়ের এ ঘরে বিয়ে দেওয়ার। সুড়সুড় করে সামেদ চলে এসেছিল। পরদিন থেকেই টগরের অন্য জায়গায় বিয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

টগর আলিজানকে বলেছিল, তুমার আব্বা যা বলছে তাতে তুমার মত কী?

শুনো টগর, আমাকে ভুল বুঝো না। আব্বা বরাবর ওরকমই। সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলার সাহস আমার নাই। তবে যা হোক একটা করতে হবেক। তুমি অস্থির হয়েো না, আমি দেখছি কী করা যায়।

পরের দিন আলিজান টগরকে বলল, আব্বার একদম মত নাই বুঝলে।

তাহলে কী হবেক আলি?

পারবে টগর আমার সাথে পালিয়ে যেতে?

পালিয়ে যাবে ভাবছ? — টগর হাসল হা হা করে। — পালিয়ে যায় ভীতুরা। আমরা কী এমন অন্যায় করেছি বল তো আলী! তুমি পারবে না গ্রামে থেকে বাপকে দেখিয়ে দিতে? আমাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে?

আলিজান টগরের কথার কোনো জবাব দিতে পারেনি, ভীৰু চাতকের মতো সুটসাঁট পালিয়ে গেছিল। আর টগরের সামনা-সামনি হয়নি।

কয়েকদিন বাদেই মামার গ্রাম থেকে টগরের বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। সামেদ তার পুরোদস্তুর প্রতিশোধ নিয়েছিল টগরের বিয়ে দিয়ে।

তিন

দু-বছর হল টগরের বিয়ে হয়েছে। এই দু-বছরে ওকে একটা প্রশ্নই তাড়া করে বেড়ায়। আমি কি ঠিক করলাম আব্বার সম্মান রাখতে গিয়ে সোহাগকে বিয়ে করে? আলির সঙ্গে পালিয়ে গেলে কী এমন ক্ষতি হত! গ্রামের মানুষ কিছুদিন হয়তো ছিঃ ছিঃ করত। তারপর তো সব চুকে যেত। আলির জীবনটা তাহলে এভাবে নষ্ট হত না। যত দোষ আমার। আল্লা সেই পাপের শাস্তি দিচ্ছে। তাই কপালে সুখ নাই। ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে।

হ্যাঁ কথাটা সত্যি। খাওয়া পরার কোনো অভাব রাখেনি সোহাগ। কিন্তু টগর মনের সুখ পায়নি। যত অশান্তি ছেলে না হওয়ার জন্য। প্রথম বছর না হয় হল না, তা বলে এবছরও? এবার শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদরা এমন ভাবে তাকাতে শুরু করেছে, যেন যত দোষ টগরের। টগর বাঁজা।

সোহাগও ধরে নিয়েছে রোগটা টগরের। কোথাও দেখাতে কসুর করেনি। কই নিজে তো একবার দেখাল না! বুকের ভেতর তুষের আগুন জ্বলে থিকিথিকি, যার আঁচে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় টগর।

কিছুদিন আগে শাশুড়ির সাথে নামোপাড়ার সামসুরা চাচি গল্প করছিল। সামসুরা চাচির মেয়েরও নাকি ছেলে হচ্ছিল না। দামোদরের ওপারে দারগাতলায় এক পির সাহেবের কাছে দেখিয়েছিল। পির সাহেব নাকি দারুণ ওষুধ দেয়। তেনার ওষুধের জোরেই ছেলে হয়েছিল। খবরটা শোনার পর থেকেই শাশুড়ি ছটফট করতে থাকে। সোহাগকে বলে, একদিন বউমাকে লিয়ে ঘুরে আয় না বাপ, আল্লা যদি কোলপানে চায়।

সোহাগ নিয়ে গেছিল টগরকে। নৌকায় চেপে নদী পেরিয়েছিল ওরা। এই প্রথম এত বড়ো দরিয়া দেখেছিল টগর। গাছতলায় একটা মাজারের পাশেই বুড়ো পির বসেছিল। রোগীর কত বড়ো লাইন। দূরে দাঁড় করানো ছিল গোরুর গাড়ি, রিক্শা, চারচাকা। গমগম করছিল এলাকাটা। নানারকম রোগের নানারকম ওষুধ। শিকড়-বাকড়, জড়ি-বুটি, পানিপড়া, তেলপড়া, তাবিজ-কবজ। লাইনে দাঁড়িয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল টগর। ডগডগে মুখটা শুকনো আমশির মতো হয়ে গেছি। যখন টগরের পালা পড়ে, তখন বুকটা টিপটি করছিল। এত লোকজনের মাঝে কী করে যে কথাটা বলে! কিন্তু কী আশ্চর্য! টগর কিছু বলার আগেই বুড়ো পির খ্যাক-খ্যাক করে হেসে বলেছিল, তোর চিন্তা নেই মা, সবুর কর। এবার তোর কোল ভরবে।

শিকড়-বাকড়ের কয়েকটা পুরিয়া দিয়েছিল টগরকে, আর একটা মাদুলি কোমরে ধারণ করতে নির্দেশ দেয়। বকশিশ দেওয়ার সময় মাথায় ঝাড়ন কাঠি দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছিল, তুই মা কোনো বাধা মানিস না। মন যেটায় সায় দেবে, সেটাই করবি।

বুড়োপিরের আশ্বাসেই সংসারের মানুষগুলো তাকিয়ে আছে টগরের দিকে।

চার

বিকালে চাঁদ দেখা গেছে। কাল খুশির ঈদ। কবরবাসীদের কাছে কষ্টের দিন। গোটা রমজান মাসটা কবরের আজাব বন্ধ থাকে, ঈদের নামাজের পরই আবার আজাব শুরু হয়। শয়তানরা এইসময় শিকলে বাঁধা থাকে, তারাও কাল মুক্তি পাবে। মানুষ কত কী না করবে! কাল মহিলারা ঘরে ঘরে পিঠে, ক্ষীর, পায়েস, লাড্ডু কতরকম খাবার বানায়। সব নতুন পোশাক পরে। পুরুষ মানুষরা সকালে উঠে গোসল করে, নতুন পোশাকে টুপি মাথায় ঈদগাহ তলায় নামাজ পড়তে হাজির হবে। চারিদিক খুশিখুশি রব। টগরের মনটা উথালপাতাল করতে থাকে।

মসজিদের মাইকে জানিয়ে দেওয়া হল সাড়ে সাতটায় ঈদের নামাজ শুরু হবে। সবাই

যেন গোসল করে ঈদগাহ তলায় হাজির হয়ে যায়। গ্রামের শেষ মাথায় মাঠের ধারেই প্রাচীরঘেরা ঈদগাহ তলা। দুই গ্রামের মানুষ নামাজ পড়ে। ওদিকে মানুষমারীর মুসুল্লিরাও আসে। দুই গ্রামের যৌথ উদ্যোগে নির্মাণ। সকাল থেকে নামাজের শেষ পর্যন্ত থানা থেকে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার দুই গ্রামের মধ্যে কী নিয়ে যেন বামেলা বাধে। সেই থেকে কড়া নিরাপত্তা।

নতুন পোশাক পরে সকাল থেকেই টুপি মাথায় ঈদগাহ তলা যাচ্ছে মুসুল্লিরা। আলিজানের কোনো হেলদোল নেই। নোংরা পোশাক পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু-তিনবার জানালার কাছে উঁকি মেরে গেছে। টগর তখন মেঝের ভেতর থাকেনি, চুলোশালে পিঠে বানাতে সাহায্য করছিল মাকে।

সাইফুল গোসল করে ঘরে ঢুকেই দেখল বুবু জানালা দিয়ে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। টু শব্দ না করে পেছনে দাঁড়িয়ে বুবুর কীর্তিকলাপ লক্ষ করে। জানালা দিয়ে বুবু খ্যাপাটাকে দেখছে।

রডের ফাঁক দিয়ে টগর একটা নতুন জামা গলিয়ে দিয়ে বলে, এটা লাও। তোমার জন্য এনেছি, গোসল করে পরে নামাজ পড়তি যাও।

খ্যাপা চলে যাচ্ছিল, টগর হাত ইশারা করে আবার কাছে ডাকে।

টগর বলে, কাউকে বোলো না যে আমি দিয়েছি জামাটা।

বুবু তুমি খ্যাপাটাকে নতুন জামাটা দিয়ে দিলে? দাঁড়াও মাকে বলছি। সাইফুল চিৎকার করে বুবুর কীর্তিকলাপ মায়ের কাছে প্রকাশ করে দিতে চায়। টগর চমকে উঠল! ভাইকে খেয়ালই করেনি। নিমেষেই পেছন ফিরে ভাইয়ের মুখটা চেপে ধরে বলে, চুপ, চুপ, একদম চুপ!

আমার পাঞ্জাবিটা কই বুবু?

দাঁড়া ব্যাগ থেকে বার করি। টগর ভাইয়ের জন্য আনা পোশাকটা বের করে পরিয়ে দেয়। চুলগুলো হাতে করে নেড়ে দিয়ে বলে, লক্ষ্মী ভাইটি, কাউকে বলিস না একথা।

সাইফুল ছোট্ট হৃদয়টুকু দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে ওই খ্যাপাটার সাথে বুবুর কী এমন সম্পর্ক, যে একটা নতুন জামা দিয়ে দিল তাকে!

আলিজান নামাজ পড়তে গেছিল নাকি টগর জানে না। তবে ওর দেওয়া পোশাকটা পরতে দেখেছে, যখন বাড়ির পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেছে রোদের বেলায়। কে যেন চুল-দাড়িগুলো মুড়িয়ে কেটে দিয়েছে। খ্যাপা বলে বোঝায় যায়নি আর।

রাত্রে পূবধারের মেঝেটায় টগর একা শোয়। সোহাগ যখন থাকে তখন এই মেঝেটায় দখল নেয় ওরা। জানালাটা খুলে দিল টগর। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। কাছে দাঁড়ালে কাস্তুর মতো বাঁকা চাঁদটা ঝিলিক মারছে।

আগের বছর ঈদে সোহাগ ছিল। জানালাটা বন্ধ করে রেখেছিল টগর। যদিও আলি তখন এতটা খেপেনি। কাণ্ডজ্ঞান ছিল। আজ সোহাগ নেই। কালই নিতে আসবে বোধহয়।

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে নিজের গতিতে। টগরের চোখে ঘুম আসছে না। খালি বিছানায় ছটফট করতে থাকে। শিকলে বাঁধা শয়তানগুলো ছাড়া পেয়ে সুযোগ বুঝে কানের গোড়ায় ফিসফিস করে বলে, ওঠ টগর, ওঠ। জানালার কাছে যা— দেখ কে দাঁড়িয়ে আছে।

টগর বলে, না, যাব না। এ পাপ!

কে বলেছে পাপ! তোর বুড়োপিরের কথা মনে নেই?

হাড়ির ভেতর মুখ ঢুকিয়ে কথা বললে যেমন শোনায়, তেমনি গমগমে গলা ভেদে এল বুড়োপিরের। টগর কানগুলো দুইহাত দিয়ে চেপে ধরে বিছানায় উঠে বসল। শিথানের পাশে রাখা পানির জগটা তুলে ঢকঢক করে গলায় ঢালল। সারা শরীর দরদর করে ঘামছে। এতক্ষণ কি খোয়াব দেখছিল টগর? সুইচ টিপে লাইটটা জ্বালাল। গোটা মেঝেটা আলোয় ঝলমল করছে। ঝলমল করছে ঘরের জিনিসগুলো। দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেভারের ডানাওয়ালা পরিটা উড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘড়িটা চলছে টিক টিক টিক শব্দ করে। রাত প্রায় শেষের মুখে। শেষরাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। তাহলে একবার তাকিয়ে দেখব নাকি জানালা দিয়ে? — টগর ভাবল, না বাবা দরকার নাই।

হঠাৎ মেঝেতে কালো ছায়া পড়ল। জানালার ওপাশে কে যেন দাঁড়িয়েছে। অপছায়া নয় তো? ভয়ে ভয়ে টগর ঘাড় ঘুরাল, তাকাতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এত রাতে!

টগর সট করে জানালার কাছ থেকে সরে এসে আড়ালে দাঁড়াল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঠেস দিয়ে কাঁপতে থাকে থরথর। বুকটা ওঠানামা করছে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে নাক দিয়ে। মনটা স্থির করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিক। তারপর চুপিসারে গুটগুট করে এগিয়ে আসে ঠেসানো দরজাটার দিকে। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে পিঁড়েতে পা রাখতে যাবে, ওমনি শিকলটা টং টং করে নড়ে উঠল। সারা গায়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল নিমেষে। পাশের ঘরে আব্বা, মা, ভাই ঘুমোচ্ছে। কেউ টের পেল না তো!

উঠোনে নেমে কলতলায় দাঁড়াল টগর। পাশেই খাঁচাটায় মুরগিগুলো বটপট করে উঠল একবার। পুকুরের ওপারে বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠে গেছে চাঁদটা। ডিমের ঘোলা কুসুমের মতো জ্যোৎস্না পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে, আর পুকুরের মাছগুলো ওপর দিকে মুখ তুলে খাষি খেতে খেতে গুবে নিচ্ছে। পানি ভরতি বদনা নিয়ে 'বার বসার' ছলনার টগর ধীর পদক্ষেপে ঘরের পেছনে খামারে এসে দাঁড়াল। জানালার দিকে চেয়ে দেখল ওখানে নেই। টগর ফিসফিস করে ডাকল, আলি!

শব্দটা প্রতিধ্বনি হয়ে টগরের কানেই ফিরে এল। আসবে না কেন! ধারে পাশে কেউ কোথাও তো নেই। তাহলে শব্দটা যাবে কোথায়? কারও না কারও কানে তো ঢুকতে হবে। তাই শব্দটা কারও কানে ঢুকতে না পেয়ে নিজের কানেই ফিরে এল, আলি-লি-লি! চমকে উঠল টগর!

খামারের পালুই দুটো বুনোহাতির মতো দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিন ব্যবহার না করায় খামারে ঘাস, ছোটো-ছোটো আলাপালা গাছের জঙ্গল ঘনিয়ে উঠেছে। খামারের দুইকোণে

একটা পেঁপেগাছ, আর একটা টিয়াঠুটে আমগাছ প্রহরীর মতো বুক ফুলিয়ে আছে। মাঝ বরাবর সরু রাস্তা চলে গেছে পোড়ো জমিগুলোর দিকে। পোড়ো জমিতে ঝোপঝাড়, লতাগুল্মের রাজত্ব। ওখানেই প্রাতঃকৃত্য সারা হয়।

টগর আলিজানকে দেখতে না পেয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে থাকে। এমন সময় পেঁপে গাছের আড়াল থেকে ফিসফিসিয়ে কে যেন ডাকল, টগর!

টগর ছটফট করে উঠল। আলিজান না? টগর আলিজানের কাছে যাবার জন্য পা বাড়াল। এমন সময় আমগাছ থেকে কে যেন আর একবার ডাকল, টগর!

হাত থেকে বদনার পানিটা ছলকে পড়ল। কে, সোহাগ না? এত রাতে এখানে! কারও কোনো বিপদ হল না তো! টগর আমগাছের দিকে গেল সোহাগকে দেখতে। আমগাছের কাছে যেতেই পেঁপেগাছটা ডাকল, টগর!

টগর পেঁপে গাছের কাছে গেল, ওমনি আমগাছ ডাকল, টগর!

কী যে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছে না টগর। তাহলে কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি আলিজানের মতো? টগর পরি-পাওয়া মানুষের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল। ওর হাসির প্রতিধ্বনি আমগাছ, পেঁপেগাছ, পালুইতলা, এমনকি পোড়ো জমির ঝোপঝাড়কে ছুঁয়ে এসে খামারের মধ্যে চরকি-ঘোরা ঘুরতে লাগল।

একবার আমগাছ থেকে সোহাগ ডাকে তো পেঁপেগাছ থেকে আলিজান ডাকে। আমগাছ, পেঁপেগাছ। পেঁপেগাছ, আমগাছ। সোহাগ, আলিজান। আলিজান, সোহাগ। ... এই ডাক ক্রমাগত চলে। টগর দুই ডাকের মাঝেই ঘুরতে থাকে।